বহুত

নিয়তি রায়চৌধুরী

পাঁচতলার এই অ্যাপার্টমেন্টটার নীচেরটাই কেবল খালি ছিল। বাকি সব ফ্ল্যাটেই ভাড়া। দোতলায় থাকে তিনটি নেপালি ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে মেয়েটি একজনের বোন। দুইবন্ধু একজন সিএ, অন্যজন এম বি এ করছে। মেয়েটি কাজ করে কলসেন্টারে প্রতিদিন তার গাড়ি আসে।

একদম টঙে এক পাঞ্জাবী যুবক থাকে। ফাইভস্টার হোটেলের এফ এন বি- তে কাজ করে। হোটেলের ড্রপেই গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। দিনভর একা ঘরে অঘোরে ঘুমোয়। তবে অফ ডে'তে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজের ঘরে কী ছাদে তার আনন্দফুর্তির অন্য ব্যাপার। কম্পাউন্ডে তখন রাতভর একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

চারতলায় প্রায়ই তালা ঝোলে। ভাড়াটে ভদ্রলোক তার ব্যবসার কাজে নিয়মিত থাকতে পারে না। আজ মুম্বাই তো কাল ভুবনেশ্বর। সর্বত্র আনাগোনার সুবিধার্থে বোধহয় কলকাতাকে সেন্টার করা হয়েছে। দরজায় এস. পারেখ লেখা। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কথাবার্তায় যথেষ্ট মার্জিত।

তিনতলার পুরোটাই মেস। একটা ঠিকে লোক এসে রান্না করে দিয়ে যায় দু'বেলা। ছ'জন নানা বয়সের মানুষ ভিন্ন কাজে, যে যার সময়ে সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করে। ছুটির বার শুনশান। কদাচিৎ কেউ থেকে গেলে বাইরে গিয়ে খাওয়া সেরে আসতে হয় তাকে।

আগাগোড়া বাড়ির সকলেই পরিযায়ী। তবু সবারই কড়া নেড়ে বিনীত পরিচয় সেরে এসেছেন শ্রীভাষবাবু। একমাত্র এ ফ্ল্যাটে একতলায়— তিনিই বোধহয় থেবড়ে গেড়ে বসতে এলেন। দিব্যি দরজায় শ্রীভাষ পালিত নেমপ্লেট লাগিয়ে, সম্মুখস্থ শহরের ময়লা, বর্জ্য - বহমান খালপাড়ের গন্ধ, মশা উপেক্ষা করে, পাশাপাশি বিস্তর বাড়ি বা ফ্ল্যাটের নির্মীয়মান সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে টিকে যাওয়াই স্থির করে নিয়েছেন। এলাকা দ্রুত ডেভলপড হচ্ছে যখন।

ফ্ল্যাটের মালিক থাকেন মফস্সলে। প্রমোটার বা কেয়ারটেকার ছব্বুলাল অবশ্য পাড়ারই বাসিন্দা। কেনাবেচার প্রসঙ্গে শ্রীভাষ পালিতকে বলেছেন কয়েকমাস থেকে বুঝে পছন্দ হলে ফ্ল্যাটটা কিনে নিতে পারেন। মালিকের সেই রকমই বলা আছে। তো প্রথমত ভাড়াটে হিসেবেই সঙ্গে তিয়াত্তর বছরের উন্মাদ মা আর তেইশ বছরের তরতাজা মেয়ে তান - কে নিয়ে শ্রীভাষ এখানে উঠেছেন। মূলত আত্মপরিজনের দূরত্ব রাখতে। তান বা তানিয়া তাঁর মেয়ে, হয়ত তানের মতোই সুরেলা হতে পারত। গলায় অগাধ সুর। মীড় গমক মূর্চ্ছনায় দ্রব হবারই তো সময় এটা। রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত তার বিষয়। কিন্তু শিল্পসম্মত এক ধারাবাহিকতারও তো দরকার! সপ্তাহে একদিন সল্টলেকে ক্লাস করে আসা ছাড়া — গানকে তান প্রাণের ভেতর স্থান দিতে পারে বলে মনে হয় না।

সমস্যা কী শুধু এক উন্মাদ! নাকি বিশেষ এক ভূমিকার অনুপস্থিতি! যে জন্য তেইশ বছরের স্বচ্ছন্দ চলা তানের হীনম্মন্যতায় কুঁকড়ে যায়।

তান আজ বছর পাঁচেক তাদের শালকিয়ার এজমালি বাড়ি এসে ইস্তক আত্মপরিজনের অতি সহানুভূতির টার্গেট। অথচ কতগুলো বছর মায়ের কাছে কাটিয়ে আসা বাদ দিলে সে তো আর পাঁচজনের মতোই এ বাড়ির মেয়ে। কেন সে দুঃখ ক্ষোভের যথার্থ শেয়ার করার আপনজন পায় না এখানে। নাকি নিয়ম। সংসারের সাধারণ চিত্ররেখার এতটুকু এধার ও ধার হলেই এমনটা হয়।

তাতে মানতে রাজি নয়। তারও এতটুকু এধার ওধার হওয়ার দিকগুলো, যেন কাকী, জেঠি, পিসি, তুতো দা বোন দিদি বৌদিদের কথায় শ্লেষ থাকলে ছেড়ে কথা বলবে না তান।

ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল সে ছুঁড়বেই। শেষমেষ শ্রীভাষ। তাঁর অবস্থা আরও কঠিন। যেন তিনিই হেতু— তিনিই হোতা। অফিসের সময়টুকু বাদে। বাকি। বাকি সর্বক্ষণ তিনি এসবের সামাল দিচ্ছেন। প্রথম ধুয়ো উঠল মায়ের পাগলামি নিয়ে। মা নাকি তাদের বাড়াভাতে ছাই দিচ্ছেন। সেটা কী রকম! দু'দুবার জেঠিমার ছোটছেলের বিয়ে ভাঙল!

আসলে একান্নবর্তী থাকাকালীন একই ছাদের তলায় এঘর ওঘর করেছেন মা একসময়। ভাগাভাগি তাঁর মাথায় থাকে না। সটান গিয়ে বসেন আগের মতোই সবার ঘরে। ভব্যিযুক্ত হয়ে পাত্রীপক্ষের সামনে চেয়ারে বসে পড়ে বলেছেন, তো বাপু মেয়ে খুব ঘুটঘুটে নয় তো?

—সেটা আবার কী, রঙের কথা বলছেন? পাত্রীপক্ষ না জেনে হেসেছেন সাধারণ একটা ইয়ার্কি ভেবে।

— না, না। বলছি ঘুটঘুটে অন্ধকারকে মেয়ে ভয়টয় পায় তো?

— ঘুটঘুটে অন্ধকার আবার কে না ভয় পায়।

মাকে ততক্ষণে হাত ধরে টানাটানি করছে বাড়ির মেয়েরা, বউমারা, উঠুন—উঠুন—বলছি—। যেতে যেতে পাত্রীপক্ষকে অবাক করে দিয়ে মা বলেছিলেন,

—পায় না, পায় না। চোর আর নচ্ছার মেয়েছেলেরা অন্ধকারকে ভয় পায় না।

পাগলের বাড়ি শুনে আর বিয়ে এগোয়নি। মার ঘোলাটে মাথার ধারণায় স্বামীর মতো মহান মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার মেয়েরা অন্ধকারের বাসিন্দা। উত্যক্ত হচ্ছিলেন ভাগাভাগির লাগোয়া বাড়ির জেঠা - কাকার পরিবার। হতেই পারেন। কিন্তু নিজের অংশ মতো আপন বৃত্তে শ্রীভাষেরও তো এত্তিয়ার আছে স্বাধীনভাবে থাকার। তা সে বৃত্ত যতই ভাঙাচোরা হোক।

কিন্তু তাই বা পারলেন কই! কেন সে অংশ ফেলে এসে তাঁকে এখানে ভাড়া নিতে হল।

মাসদুয়েক হয়ে গেল শালকিয়া ছেড়ে এসেছেন। আপনজন ছেড়ে আসার গ্লানি মুছে ফেলতে দুদ্দাড় হাতে গুছিয়ে ফেলেছেন ভাড়াবাড়ির ঘরদোর। একমাত্র নীচের তলার এই ফ্ল্যাটেরই দুটো দরজা। একটা কমন সিঁড়ির দিকে, অন্যটা তাদের নিজস্ব সামনের এন্ট্রান্স। এই সামনের একফালি বাঁধানো উঠোনের মাঝমধ্যিখানে ঝাঁকালো এক নিমগাছ রয়েছে। তার বেশ কয়েকটা ফ্যাঁকরা ডালপালা সামনের দিকে ঝুঁকে ঘরের আলো বাতাস আটকে দিচ্ছে। বারান্দায় ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা — জল টোপাচ্ছে বৃষ্টি হলে। একটু ছেঁ টে কেটে দেওয়া দরকার। ব্যাপারটা খেয়াল করে তা-ই ধমকেছে বাবাকে - আস্ত একটা গাছ ঘরে ঢুকছে তোমার কি চোখে পড়ে না! দেখতে

পাও না পাগল আর তার এক আনপড় আয়া নিয়ে সারাদিন কী তাণ্ডব চলে! তার ওপর ওই গাছ। ভর দুপুরেও বারান্দায় আলো জ্বেলে রাখতে হয়...।

মাকে দেখাশোনার সবিতা নামের মেয়েটিকে তান - এর পছন্দ নয়। বায়োডাটা জমা দিয়ে সেন্টার থেকেই সে এসেছে এবং ট্রেন্ড। বৃদ্ধা পাগলের উদ্ভট সব কাজে কথায় তার হেসে ওঠা তানের নজর এড়ায় না। সাফ তাকে বলেই দেয় তান, এটা কাজের জায়গা মাসি। গ্রীনরুম নয়। ঠামিকে চানের ঘরে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ! মাথায় জলঢালা ছেড়ে সে একা নাইটি পরে ফেলল।

—না মানে আমি তো দেখুন এইমাত্র।

—কাল দেখলাম টেবিলে ভাত খেতে বসে আগেই উঠে গিয়ে একখিলি পান খেয়ে এল...।

—সে আর আমি কী করব বলুন...।

—কেন লুকিয়ে রাখতে পার না!

—রাখি তো আপনি জর্দা লুকোতে বলেছিলেন। না পেয়ে সেদিন মসারি চিবিয়ে ফুটো করে রেখেছে।

কথা বাড়াতে ইচ্ছা না থাকলেও সবিতা জানাল, সেদিন আমার খুঁট থেকে পয়সা খুলে নিয়ে বাইরে ইস্তিরি করে যে ছেলেটা, তাকে দিয়ে পান আনিয়ে খেল। আর...। তান তীক্ষ্ণ গলায় বলে, বলে যাও আর?

সবিতা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, আমাকে বলে ঝাঁটাখাগি। তুই তানের মায়ের মতো নচ্ছার মেয়েছেলে...।

অমনি তড়াক করে উঠে পড়ে তান ঠাকুমার নাইটির বেল্ট চেপে ধরেচে— কী বলেছে! হাড়বজ্জাত বুড়ি! আর একটা বাজে কথা বলে দ্যাখো, ঘরে বন্ধ করে রাখব না হয় বাইরে বার করে দেব...।

বুড়ি কী বুঝল কে জানে, একগাল হেসে বলল, কখন দিবি? তালা খুলে দে না একবার— ওপরটা ঘুরে আসি!

ততক্ষণে তানের ফোন চলে গেছে বাবার অফিসে, শোনো বাবা, দরকার হলে তুমি চাকরি ছেড়ে বাড়িতে বোসো। আমি বাধ্য নই তোমার পাগল মা-র দায়িত্ব নিতে। বলে কিনা...। এবার কোনওদিন সিঁড়ির দরজা খোলা পেলে ওপরে উঠে যাবে। নতুন জায়গা— যার তার কাছে খ্যাপামি দেখিয়ে আসবে, ভাল হবে? সবিতা বয়সে যথেষ্ট বড় সত্ত্বেও তানকে আপনি বলে কথা বলে। আর বাবার সঙ্গে তানের এইরকমই কথাবার্তা হয়।

আসলে জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রবল বেড়ে ওঠার এই বয়সটায়, আছড়ে পড়ার জায়গা তার সামনে বাবা-ই। অন্যদিক যেহেতু তার নাগলে থাকে না সেই অসহায়তা দাবিয়ে, তেড়েফুঁড়ে টিকে থাকাই তার কাছে জরুরি হয়ে গেছে। বাবা - মার ছেঁড়া দাম্পত্যে— কে দায়ী কে নয় কারও পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিতে সে পারেনি। যদিও আত্মীয়দের কথা গেছে মা-র বিপক্ষে। তবু তান নিজের ইচ্ছামতোই মার ছত্রছায়া ছেড়ে বাবার কাছে চলে এলেও, বাবাকেও তাঁর যথাযথ অধিকারের উৎরোতে সীমাহীন অনীহা। দুই ঠিকানার মধ্যবর্তী তানও এক অস্থির পরিযায়ী। তো এই চলছে গত পাঁচ বছর ধরে।

সপ্তাহের মাঝখানেই ছুটির কথা ভাবতে হয়েছে শ্রীভাষকে নিমগাছের ডাল ছাঁটবার জন্যই। মেয়ে বারকয়েক বলেছে ব্যাপারটা নিয়ে। তটস্থ থাকেন কখন কোন কোপ পড়ে। তার শাসন খবরদারি জেদ অভিমান শ্রীভাষ বিগতদিনের একাকী থাকার অসহায়ত্ব দিয়ে শুষে নিতে পারেন, আত্মার বড় কাছাকাছি এই প্রাণপুতুলি যে!

মাত্র পঁচিশদিনের তানকে নিয়ে স্বাতী ও শ্রীভাষ যখন আনন্দে টুইটুম্বুর। শালকিয়ার বাড়িতে সবার এ কোল ও কোল হচ্ছে তান। মাতৃত্বের নানা কাজে স্বাতী সময়হীন। গরমজলে বোতল ফোটাচ্ছে দুধের তো স্নিগ্ধ শরীরের দুঘ খাওয়াচ্ছে মেয়েকে। রাতের দরজা বন্ধ হলে চোখের কোন দিয়ে হাসছে শ্রীভাষের দিকে তাকিয়ে, বলছে, দেখতো মনে হচ্ছে তোমার মতোই হবে। তবে অতখানি ছুঁচলো থুতনির বোধহয় দরকার নেই। স্বাতী কী ভেবেছিল— কথাটা স্বাতীর দিকেই ফিরিয়ে দেবেন শ্রীভাষ! কিন্তু শ্রীভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে বলেছিলেন, না না আমার মতন হবে না...। স্বাভাবিক ভাবে অপরূপ সুন্দরী তাঁর মায়ের তুলনাই এসে গিয়েছিল মুখে, বলেছিলেন, হুবহু আমার মা-র মতন। আনন্দী ঠাকরুণ গো...। দেখছ না থুতনিটা...!

মুখ শুকিয়ে গেল স্বাতীর। চোখ সরু সন্দিগ্ধ হয়ে নেমে এল মেয়ের মুখের দিকে। কথা আর এগোল না।

দরজা বন্ধের পর, রাত গভীর হলে যে কথায় ঝটপট করে উঠল স্বাতী, —বিয়ের আগে তোমরা তো কেউ বলোনি যে তোমার মার মাথা খারাপ ছিল!

ঘুম চটকে প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন শ্রীভাষ, দৃশ্যত তবু নিস্পৃহের মতো একটা হাই তুলে বলেছিলেন, মার তো ঠিক মাথা খারাপ নয়। আসলে ছোট থেকে একটু ছিটখুপ্‌রি মতন... আর কী। সে আর একটু - আধটু কে নয়। —তাই নাকি! তবে এত ওষুধ— ধরপাকড়— অ্যাসাইলামে রাখা কিসের জন্য?

শ্রীভাষ এ মুখ হলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা বাড়ল, তাই। কিন্তু মা তো এখন ভালই আছে। শ্রীভাষ সব বুঝেও নিস্পত্তির দিকেই এগোলেন।

শুনশান কেটে গেল অনেকটা সময়। ঘড়ির টিকটিক আর মেয়ের বুকের ধুকপুক শব্দ শব্দমান। স্বাতীর ফোঁস ফোঁস কান্না শোনা গেল এরপর। বলল, ভাল করোনি। জীবন নষ্ট হল একটা। নিশ্চয়ই জান, মানুষের যাবতীয় ভালমন্দের মূলে থাকে জিনপ্রক্রিয়া। থার্ড জেনারেশনে তা খুবই অ্যাকটিভ। তোমার উন্মাদ মা-র জিন আমার মেয়ের মধ্যে...। ফুঁপিয়ে উঠল স্বাতী, বলল, এরপরেও তুমি গর্ব করে বলছ মেয়ে হবে তোমার মা-র মতন।

শ্রীভাষ সামাল দেবার চেষ্টায় মরীয়া হলেন, স্বাতী, আমি চেহারার কথা বলেছি। মার অসামান্য রূপের কথা বলেছি। ওই রূপের জন্য মার বিয়ে হয়েছিল বিনাপণে।

—রূপ? কী কাজে লাগে শ্রীভাষ ওই রূপ! বেশ তো সেটাই তোমরা বলতে পারতে। লুকোলে কেন! তোমার কাকিমাদের কাছে শুনেছি, পাকা দেখার সময় তোমার মাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল চিলেকোঠার ঘরে কেন এমন করলে? তুমিও তো জানতে। তে বড় সত্যের মুখে শ্রীভাষ কথা খুঁজে পাননি।

পরের দিনটি অন্যদিনের মতোই হয়ে গেল। খাওয়া - শোওয়া, বাচ্চা দেখা, শ্রীভাষের রুমাল, পার্স গুছিয়ে হাতে তুলে দেওয়া— সব। শুধু ঠিক হল না বোধহয় হোঁচট খাওয়া চিন্তাটা স্বাতীর। স্বামীকে প্রস্তাব দিয়েছিল শালকিয়ার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও

সরে যাবার। কিন্তু কার কাছে ফেলে যাবেন বিধবা উন্মাদ আনন্দীকে! তিনিই একক সন্তান তাঁর। কোনও অ্যাসাইলাম; সে তো বিপুল ব্যয়ভার। বাড়ির বাকি সবাই তো উৎপাতে ত্রস্ত!

—তা হলে!

—তা হলে তো...।

তাহলেও কোনও উপায় বাতলাতে পারেননি শ্রীভাষ। পারার জন্য অন্তত চেষ্টাটুকু দেখলেও হয়ত স্বাতী আশ্বস্ত হত। হল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীভাষকে বলতে শুনল, যা ভাল বোঝে করো। আমি নিরুপায়

মেয়ে নিয়ে স্বাতী চলে গেল শ্যামনগরে তার চাকরিজীবী মা-র কাছে।

শ্রীভাষ সরতে পারেননি। স্বাতীকে আনতে পারেননি। মেয়েকেও কাছে পাননি আইন মোতাবেক। সে বড় যন্ত্রণার কাল। স্বাতী স্বাবলম্বী হয়ে মেয়েকে মানুষ করছে। এটাই শুনেছেন। জানেননি মেয়ে প্রাপ্তবয়স পেয়ে আর কী জানল। জানার দরকার হল না। হঠাৎ এক সকালে ব্যাগ হাতে তান এসে হাজির। তিনি তো থ। কীভাবে, কেমন করে বিনা যোগাযোগে, শুধুমাত্র আক্ষরিক ঠিকানার নির্দেশে মেয়ে এল, জিজ্ঞাসা করবেন কী, বুকে টেনে নেবেন কী, ঠিকরে সরে গিয়ে বলল তান, —তোমার কাছেও থাকতে আসিনি। তোমাদের দু'জনেরই তো নিয়ম মতো আমাকে মানুষ করার কথা। একজন করছে। কিছুদিন তুমি করো। পায়ে দাঁড়ালে আমিও চলে যাব।

—তা কেন। তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমি বরাবর চেয়েছি। এখনও চাইছি। সর্বক্ষণ যাই যাই কেন। একটু স্থির হও। একটু শান্তি দাও...। শ্রীভাষের ঠোঁট কাঁপে। চোখ ঝাপসা। মেয়ে হাসল। যাক তাহলে ট্রেসপাস করিনি বলো...। তান কী ভেবে নিজেই সোফায় এলিয়ে বসল, বলল—মা আমাকে ছাড়েনি। অফিস গেলে আমি বেরিয়ে এসেছি। দিদার তো রিটায়ার করার পর শুধু পুজোআচ্চাটাই বেড়েছে। ওপরে ঠাকুরঘরে ছিল। আমি অবশ্য বুথ থেকে ফোনে মাকে জানিয়ে দিয়েছি। আর কী, আমি তো অ্যাডাল্ট। চেষ্টা কোরও না, বাবা রাজি থাকলে আমি শালকের বাড়িতেই থাকব। ততক্ষণে ভাগাভাগি বাড়ির উঁকি শুরু হয়েছে, উপস্থিতিও। অফিসটাইমের সকাল। নিজের ঘরে, নিজের আত্মজাকে রাঁধুনির হাতে রেখে কী খাওয়াবেন, কী স্বাচ্ছন্দ্য দেবেন ভাবছেন, তবু বললেন, তুমি কী মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ?

—না

—তবে তো মা আচমকা দুঃখ পাবে!

মেয়ে বলল, দুঃখ? সে কে না পায়। মা আমাকে বলেছে ঠাকুমার জন্মগত পাগলামির কথা জিন ধেয়ে আসার কথা। এও বলেছে সম্পর্ক ছেঁড়ার মূল কারণ নাকি এটাই তোমাদের।

আমি বললাম, তাহলে বাবাকে নিয়ে সরতে চেয়েছিলে কেন? মা বলল, আর কোনও উপায় ছল না। সর্বক্ষণ একটা ভয়ের চিন্তায় আমি সিঁটিয়ে থাকতাম। তবু তোমার বাবা রাজি হননি।

—সেখানে তোমার জিন রেহাই দিত? এই যে আমাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছ, গ্যারান্টি দিতে পার আমি পাগল হব না!

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মা-র মুখ সাদা হচ্ছে। মা বলল, জানি না। সবসময় আমার একটাই ভাবনা, শেষ পর্যন্ত কী হবে...।

আমি বললাম মা-কে, সবচেয়ে ভাল, তুমি আমাকেই বাদ দাও। আমিও তো তোমার আতঙ্ক। হোল লাইফ কত বয়ে বেড়াবে এই আতঙ্কটা।

সকালটা কেটে গেল— নিমডালগুলোর কোনও ব্যবস্থা হল না। অথচ ছুটি নিয়েছেন শ্রীভাষ এজন্যই। দোতলাটা একবার ঘুরে এসেছেন। নেপালি ছেলে দুটি যথেষ্ট হেল্পফুল হলেও ওদের কাছ থেকে বড় একটা তরকারি কাটা ছুরি ছাড়া দা কী কাটারি কিছু মিলল না। ছুরি দিয়ে তো ডাল কাটা যাবে না। তান বলেছিল, কেয়ারটেকার ছব্বুলালকে খবর দিতে। সকালে জোর এক পশলা বৃষ্টি হল। তার ওপর মা-র জর্দার বিরক্তিকর বায়নাক্কা সামলাতে আর বেরোতে পারলেন না। অনার্সের বছর। মেয়ে তবু ক্লাস অফ দিয়ে সাড়ে তিনটের মধ্যে বাড়ি এসে গেল। শ্রীভাষ খাওয়া পরবর্তী সোফায় শুয়ে টিভি খুলেছেন। দরজায় শব্দ পেয়ে সবিতা দৌড়ে খুলে দিয়ে এল। তান দু'খানা ঘর পেরিয়ে বারান্দার আগে থমকে অগ্নিমূর্তি।— কী ব্যাপার! বৃষ্টিভারে নুয়ে পড়া নিমগাছ দেখিয়ে বাবাকে বলল, কাটোনি? শ্রীভাষ সামান্য হেসে বললেন, —যা বৃষ্টি! দা কাটারি কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। ছাব্বুলালকেও ডাকা হল না। ছুটিটা মাঠে মারা গেল। যাক্‌গে এই রোববারে ঠিক কেটে দেব। —তাই! কাটারির অভাবে কাটা গেল না! রোববার কাটবে? তান দৃকপাতহীন দৌড় লাগাল সামনের দিকে। উন্মত্তের মতো ঝাঁপ দিয়ে ঝুলে পড়ল নিমগাছের অবনত শাখাগুলো ধরে। —দেখবে নাকি কাকে বলে ভাঙা, কাকে বলে কাটা দেখবে? তার ঝুলে - পড়া চাপে মড় মড় করে শব্দ তুলল দু'একটা মোটা নিমের ডাল। কিন্তু ভেঙে বিচ্ছিন্ন হল না দেখে ফের তির বেগে দৌড়ল ঘরের দিকে। টেবিল থেকে তুলে নিল বড় ছুরিখানা যেটা তার বাবা নেপালিদের কাছ থেকে এনেছিল। এলোপাতাড়ি সেই ছুরির সে কোপ বসায় গাছপাতা ডালের যত্রতত্র অথবা শূন্যে। শ্রীভাষ হতভম্ব। ভয় পেয়ে মেয়েকে টেনে আনতে যান, সরে আয়... ওরে... সরে আয়... এবারের মতো থাম, ভুল হয়ে গেছে...। দেখছি, আমি দেখছি কী করতে পারি...।

গাছের শাখা লক্ষ্য করে, ছুরি হাতে উপর্যুপরি লাফায় তান, প্রবল অমানবিক চিৎকার। কষে তার থুথু জমে উঠেছে, গলা ফাটিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বলে, তুমি, তু-উ-মি স্থবির— তুমি ওয়ার্থলেস— তুমি অমানুষ। জান না অবস্ট্যাকল কাকে বলে— কী করে সরাতে হয়। শুধু আস্ত জিনিস ধ্বংস করতে তুমি বেঁচে আছ...।

—তাই হল। ঘাট মানছি মা। সরে আয়...। শ্রীভাষও কাতরান। খুলে গেছে পাশাপাশি ফ্ল্যাটের জানলা, ব্যালকনিতে মানুষের মুখ। নেমে এসেছে দোতলা, চারতলা, পাঁচতলাও। ছায়া ছায়া নিজের ঘরে আনন্দীর চুনখয়ের মাখা রুমালের কোণ চিবনো থেমে গেছে দুম করে।

সবিতা সাহসে ভর করে জাপটে ধরতে গেল তানকে, কিন্তু প্রতিদিনের দেখা তান মৃগেলমাছের মতো ঘাই মেরে বলল—বেরিয়ে যাও নচ্ছার মেয়েছেলে কোথাকার...। ছুরির কোপ পড়ল এধার - ওধার উপর্যুপরি এবং পিছলে নিজের বাঁহাতে গেঁথে গেল যখন, ছিটকে লুটিয়ে চাতালে পড়ে গেল তান...।

হতভম্ব শ্রীভাষ কী হল! কী হল! করে দৌড়ে গেলেন মেয়ের দিকে এবং ভয়ানক চমকে উঠলেন, কেউ একজন যখন ভিড় থেকে এগিয়ে এসে বলল, মনে হচ্ছে নার্ভাস ব্রেকডাউন। জোড়াব্রিজের কাছে এই সাইক্রিয়াটিস্ট বসেন; কল করবেন?